দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 JUL 2009
পৃঃ ... ১ / কলাম ... ৬

এমপিওভুক্তি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে চলছে তদবির বাণিজ্য

॥ নিজামুল হক ॥

এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষা বিভাগে তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিনই শতাধিক আবেদন জমা পড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা ব্যস্ত রয়েছেন। সংসদ সদস্যরা নিজস্ব প্যাডে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলেও তার অনুসারীরা লোকজন মন্ত্রণালয়ে এসে তদবির শুরু করেছেন। তারা যোগাযোগ করছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারির সাথে। এ ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন।

চার বছর ধরে বন্ধ, আবেদনপত্র জমা পড়েছে সাড়ে তিন হাজার, তদবির করছেন রাজনৈতিক নেতারা

চার বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও (মাসুলি পে অর্ডার) ভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। চারদলীয় জোট সরকার সর্বশেষ ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২০০৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৭৫৭ টি স্কুল এমপিওভুক্ত করেছে। এর পর আর নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। সরকারও চলতি বাজেটে এমপিওভুক্তির জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন এমপিওভুক্তির জন্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার আবেদন জমা পড়ে আছে। আবেদনকারী স্থানীয় সংসদ সদস্য হলেও এর পেছনে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও স্থানীয় প্রভাবশালী সরকার দলীয় নেতারা। অনেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা চাঁদা তুলে দিচ্ছেন প্রভাবশালীদের। তারা মন্ত্রণালয়ে এসে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সাথে আর্থিক লেনদেন শুরু করছেন। এসব কর্মচারিরা তাদের কাছে মন্ত্রণালয়ের ভেতরের খবর দিচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কখন কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কম্পিউটারে কি টাইপ করা হচ্ছে, এমনকি উচ্চমহলে তদবির করে এমপিও পাইয়ে দেয়া হবে এমন বিষয় নিয়ে আর্থিক লেনদেনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

(৪র্থ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এমপিওভুক্তি নিয়ে

(হবর পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট বিভাগ জানিয়েছে, এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৭ কোটি টাকা চেয়েছিল। কিন্তু পাওয়া গেছে ১১২ কোটি টাকা। এ টাকা দিয়ে ৭৭ প্রতিষ্ঠান এমপিও করা যাবে। কিন্তু আবেদন এর পর্যন্ত প্রায় প্রায় তিন হাজার। প্রতিদিনই গড়ে আবেদন আসছে। আবেদন করা সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যাবে না। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে কোন কাজ হবে না। মন্ত্রণালয় থেকে কারো সাথে আর্থিক লেনদেন না করার জন্য মন্ত্রণালয় জানানো হয়েছে। অন্যদিকে নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি এমপিওভুক্ত করার লক্ষ্যে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বর্তমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। নতুন নীতিমালা প্রণয়নের পর আবেদনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদনপ্রক্রিয়া নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রধান সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রফেসর উপাধ্যক্ষ ড. আজাদুল আহসানের নেতৃত্বে কমিটির সদস্যরা হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিটির বাস্তবায়ন হলেন জন হেলেন, মন্ত্রণালয় সদস্য অধ্যক্ষ গাজী আজহার আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ উল্লা রশিদ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নিতাই চন্দ্র মুখার্জী, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ, জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশন প্রফেসর মোঃ আলী আকবর আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক এম. এ. আউয়াল সিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (কলেজ) মাইনুদ্দীন বাবুল, বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ।

সরকার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সরকারি অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে বর্তমান নীতিমালার বিভিন্ন অসঙ্গতি ও প্রয়োজনীয় সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া কোয়ালিটি স্টান্ডার্ড, মানবল কাঠামো ও অবকাঠামো প্রস্তুতির আনুষঙ্গিক হবে বলেও না জানা, রাজনৈতিক প্রভাবহীন নিয়ে নীতিমালা তৈরি বিষয়ে আলোচনা হয়। মাধ্যমিক স্তরের ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণীর জন্য দুই বার সময় বৃদ্ধি করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (অর্থনীতি) ও যুগ্ম সচিবকে (নীতিগত ও সমন্বয়) কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা এবং নতুন নীতিমালা প্রণীত হবার পর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

২০০৬ সালে প্রবর্তিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার গুণগতমান পরিবীক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল ও সরকারি মূল্যায়ন সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে শুরু করে স্বীকৃতি প্রদান, স্বীকৃতি নবায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠদান পরীক্ষার অংশগ্রহণ, পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের জন্য কুলানো নীতিমালা বাস্তবায়নে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা মানছে না। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৩৭৯টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল, ১৪৮টি মাধ্যমিক স্কুল, ২৯৩টি নবীন মাদ্রাসা, ৩৩টি বিনিময় মাদ্রাসা, ৭৯টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ১৮১টি ডিগ্রী কলেজে বিদ্যমান নীতিমালা অনুসারে কুলানো শিক্ষার্থী নেই। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। যেসব প্রাথমিকে এমন কলেজ রয়েছে যেখানে কোন শিক্ষার্থী নেই। অথচ বছরের পর বছর শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন নিচ্ছেন। অন্যদিকে বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিভুক্তি বাবদ সরকারের প্রতি বছর ৩ হাজার ১৮ কোটি টাকা, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ১২ শতাংশ। এছাড়া নতুন এমপিও জন্য বাজেট রাখা হয়েছে ১১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে অতিরিক্ত কলেজ রয়েছে ৫১৯টি, ২ হাজার ১৮টি মাদ্রাসা এবং ২ হাজার ১৭৯টি অতিরিক্ত স্কুল।

বিগত এক দশকে দুইটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। স্থানীয় সংসদ সদস্য বিগত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেসব হচ্ছে ও যেসব প্রতিষ্ঠান। প্রভাব খাটিয়ে অনেকেই নিজের নামে মেয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নামে হাইস্কুল অথবা মাদ্রাসা স্থাপন প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের বেলায় বড় প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই প্রাধান্য পেয়েছে। যে কারণে বিগত এক দশকে এমন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্তই কম। অথচ অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় শিক্ষার্থীরা যেখানে পড়ছে। [illegible] দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নেয়ার পরিবর্তে বিরোধ সৃষ্টিতে।

কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেন, ২০০১ সালের ঐ প্রতিবেদন এবং ২০০৬ সালের তথ্য বিবেচনা করে এমপিভুক্তি নেয়া হবে। এছাড়া নতুন নীতিমালার আলোকে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আজহার বিশিষ্ট বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে নীতিমালা হবে এবং সে অনুযায়ী এমপিভুক্তি হবে।

যেভাবে বাড়ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

১৯৯০ সালে দেশে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৪৪৯টি। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ এই ২০ বছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৮০ শতাংশ। ২০০৪ সালে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ হাজার ৭৩৬টি। ২০০১ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত এমপিভুক্ত করা হয় ২ হাজার ৫১৬টি। গত ১১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদে জানিয়েছেন, জোট সরকারের আমলে ২ জুলাই ২০০১ থেকে ৩০ জুন ২০০৫ সাল পর্যন্ত ৭৩৭টি স্কুল এমপিভুক্ত করা হয়েছে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা এমপিভুক্ত হয়েছে ৮ হাজার ৮২৯টি। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৭১৫টি। ২০০৪ সাল পর্যন্ত কলেজ এমপিভুক্ত হয়েছে ২ হাজার ৮৫৩টি। ১৯৯০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮৪৮টি। ১৯৮৪ সাল থেকে এমপিও নিয়মিত চালু করার কারণে এবং ১৯৯০ সাল থেকে এমপিও-এর পরিমাণ ৫০ থেকে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। সাইকেল উইকারের দেশে তিন যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক বেড়েছে। এ সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৪ গুণ, ছাত্রের হার ৩ গুণ, শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৫ গুণ এবং সরকারি ব্যয় ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমানের দিকে যেন উন্নতি হয়নি।

রাজধানীর ৫টি উপজেলায় ২১টি কলেজ রয়েছে। ঢাকাতে ১টি ইউনিয়নে ৫টি পর্যন্ত কলেজ রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের চারটি উপজেলায় ৮টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন থাকলেও মেয়েদের স্থাপনের কোনো উদ্যোগ নেই। বিদ্যমান সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা কমপক্ষে ৮ হাজার থাকতে হবে। এছাড়া পৌর ও সিটি এলাকার নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার শর্ত রয়েছে। মফস্বল এলাকার জন্য এই শর্ত তিন কিলোমিটার পর্যন্ত। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হতে হবে কমপক্ষে ১০ হাজার। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ১০ হাজার এবং এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব হবে ১০ কিলোমিটার। কিন্তু বিগত দুইটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বেলায় এসব নিয়মের কোন মর্যাদা দেয়নি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ হাজার ৫৯০টি অপ্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদেও ৩ হাজার ৭০৬টি প্রয়োজনীয় স্থানে নেই কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী এসব স্থানে আগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল হওয়ার কথা। সংশ্লিষ্ট সেক্টর সূত্র জানায়, প্রয়োজনীয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে বান্দরবানে ৫টি স্কুল, চট্টগ্রামে ২০টি স্কুল, ৯টি মাদ্রাসা ও ১২টি কলেজ, কক্সবাজারে ১৩টি স্কুল ও ৬টি মাদ্রাসা, রাঙ্গামাটিতে ৫টি স্কুল ও ১টি কলেজ, খাগড়াছড়িতে ৪টি স্কুল, ফেনিতে ১২টি স্কুল, ৫টি মাদ্রাসা ও ৭টি কলেজ, নীলফামারীতে ১১টি স্কুল, ৪টি মাদ্রাসা, ৯টি কলেজসহ ১৬টি অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একইভাবে কুমিল্লায় বিভিন্ন ধরনের ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলাতে ৩১টি, দিনাজপুরে ১২৮টি, নোয়াখালীতে ১৫টি, মাদারীপুরে ২২টি, গাজীপুরে ১২৯টি, ফরিদপুরে ১৩টি, কুষ্টিয়াতে ৯টি, ঝিনাইদহে ৪১টি, ফরিদপুরে ১৬টি, রাজবাড়িতে ৩০টি, মাদারীপুরে ২৫টি, গোপালগঞ্জে ২৫টি, জামালপুরে ৫০টি, শেরপুরে ১৫টি, কিশোরগঞ্জে ৪২টি, ময়মনসিংহে ২০৯টি, সিলেটে ২১২টি, মৌলভীবাজারে ২৫টি, হবিগঞ্জে ১১৯টি, সাতক্ষীরায় ১০১টি, বাগেরহাটে ১৭৫টি, খুলনায় ৭টি, নেত্রকোণায় ২টি, জশোরে ৩২৯টি, নড়াইলে ৩৬টি, ঝিনাইদহে ৪২টি, মাগুরায় ৬৩টি, ঝিনাইদহে ১৫৪টি, পটুয়াখালীতে ২৮৯টি, বরগুনায় ১৯৯টি, পিরোজপুরে ২৫০টি, বালকাঠিতে ১৯৪টি, ভোলায় ৯৯টি, পাবনায় ১১৭টি, টাঙ্গাইলে ১৭৪টি, নিয়াজপুরে ৩৩৬টি, নীলফামারীতে ৬৪টি, রংপুরে ২১৯টি, গাইবান্ধায় ১৭৯টি, কুড়িগ্রামে ১১৬টি, ঠাকুরগাঁয়ে ১২৫টি, জয়পুরহাটে ৮০টি, নওগাঁয় ১৯২ টি, রাজশাহীতে ৩০১টি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১০৯টি, নাটোরে ১১৭টি, নিয়াজপুরে ১০১টি, পাবনায় ৫৩টি এবং সিরাজগঞ্জে ১৭টি।

ঐ হিসাব অনুযায়ী দেশে সর্বোচ্চ ৩৬৯টি অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে দিনাজপুরে। সংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফেনী জেলা। এ জেলায় অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩২৯টি।